গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ-১৫ সংখ্যা-৫ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৮ RNI No WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৫ টাকা

কেন ?

১. ফোলানো বেলুন পাশে ঝুলে থাকা কাগজকে নিয়ে একসাথে চলবে।
২. চুম্বক শলাকার উপরে তড়িৎপ্রবাহ শলাকাকে বিক্ষিপ্ত করবে।
৩. গ্লাসের জলে টর্চের আলো একটি বিশেষ অবস্থানে জল ও বাতাসের তল থেকে ফিরে আসবে।
৪. ফানেলে ফুঁ দিলে মধ্যেকার আলগা বল ফানেলে আটকে থাকবে।

❑ প্রচ্ছদ কথা ২ ❑ হাতে কলমে বিজ্ঞান ৩ ❑ আগুন কাঠি ৪ ❑ অঙ্ক ৬
❑ যারা হারিয়ে যাচ্ছে ৭ ❑ নতুন গবেষণা ৮ ❑ মহিলা বিজ্ঞানী ৯
❑ কুসংস্কার ১১ ❑ ভূগর্ভের আশ্চর্য জগতে ১২ ❑ মহাকাশ ১৪
❑ দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ১৫ ❑ জানো কি? / কবিতা / কার্টুন ১৬

আমাদের কথা : ‘কেন’ নয় কেন?

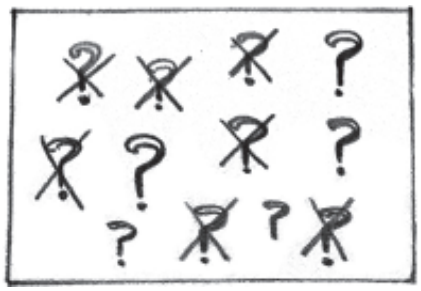

‘কেন’ কি কম পড়িয়াছে? মানুষ কি প্রশ্ন করছে না? তেমনভাবে ‘কি-কেন’ প্রশ্নগুলি মানুষের জিজ্ঞাসায় আসছে না কেন? অথচ মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাতে আসলে ‘কি কেন’-রা হাত ধরাধরি করে আছে। সেই আদিম সময়ে যখন মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা নিরন্তর সংগ্রাম করছে; দাবানল দেখে মানুষের প্রশ্ন—কেন? উত্তরের সন্ধানে আগুনের ধর্ম জানল। গাছের গুঁড়ি ঠেললে গড়িয়ে যাচ্ছে—কেন? আবিষ্কার হল চাকা। পাথরকে হাতে ধরে সরাসরি আঘাত না করে একটি দন্ডে বেঁধে আঘাত করলে—আঘাত অনেক বেশি জোরদার হচ্ছে—কেন? এল কুঠার। গাছ থেকে খসে আপেল মাটিতে পড়ল—কেন? উপরে উঠল না কেন? পেলাম মাধ্যাকর্ষণ সূত্র। গ্যালাপাগো দ্বীপে বিচিত্র দর্শন প্রাণীদের দেখে মনে প্রশ্ন এল—কেন? পেলাম পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তির ব্যাখ্যা—বিবর্তনবাদ, যা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেকার জীবের উৎপত্তির বিচিত্র ব্যাখ্যাগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করল। এইরকম আরো কতশত ‘কেন’-রা কতশত আবিষ্কারের জননী হয়ে রইল। মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব করে তুলল।

অথচ আজ কি সমাজে, কি বিজ্ঞানে ‘কেন’কে যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি বিদ্যালয় শিক্ষাতেও MCQ প্রশ্নের ধারায় আবছা স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হচ্ছে। এখানে ‘কেন’-র স্থান কোথায়?

—তাপস মজুমদার

সু ম ন ভ ট্টা চা র্য্য

প্রচ্ছদ কথা

দর্শকদের চোখে মুখে যখন খুশির উজ্জ্বল ঝলক অথচ গলায় আফসোসের ‘চুক-চুক’ শব্দ, মঞ্চে তখন এক চুরাশি বছরের বৃদ্ধ ম্যাজিশিয়ান বিজ্ঞানের মন্ত্রে মুগ্ধ করে চলেছেন! ম্যাজিক-ই তো’! তবে বুজরুকি নয়— বিজ্ঞানের ম্যাজিক।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে হাতে কলমে বিজ্ঞানের সহজপাঠের একের পর এক অত্যন্ত সরল-সাবলীল পদ্ধতি দেখিয়ে চলেছেন বিজ্ঞানসাধক সমর বাগচী।

মাধ্যাকর্ষণ, নিউটনের তিন সূত্র, বায়ুর চাপ, চুম্বকের ধর্ম সহ অজস্র জটিল বিষয় হাতে কলমে দেখিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সাধারণ সহজলভ্য কিছু বস্তুর সাহায্যে।

গত ১৪ জুলাই, রবিবার কাঁচরাপাড়া অ্যালবার্ট্রস স্কুলের নতুন সুদৃশ্য অডিটোরিয়ামে বিজ্ঞান দরবার ও বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার উদ্যোগে হয়ে গেল হাতে কলমে বিজ্ঞান কর্মসূচী।

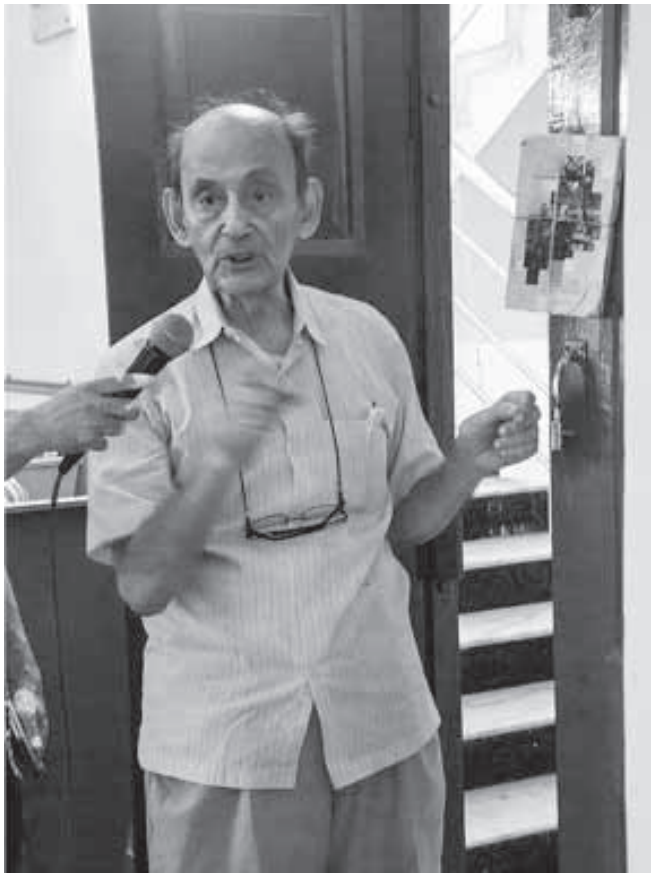

প্রদর্শনরত সমর বাগচী *ছবি তাপস মজুমদার*

বিজ্ঞানকে সহজ সরলভাবে বোঝা ও বোঝানোর এই উদ্যোগ কিন্তু খুবই গভীর অর্থ বহন করে। শুধুই তো পরীক্ষার নম্বর বাড়ানো নয়, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহার বা গ্রামেগঞ্জে যে বুজরুকি, কুসংস্কার গভীর শিকড় গেড়ে বসে আছে, তাকে সমূলে উৎপাটিত করতেও এই ধরনের কর্মসূচীর প্রয়োজন। তাই এই প্রয়াসে সামাজিক- সাংস্কৃতিক দিকটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

Moblile : 9830464582

স ম র কু মা র বা গ চী

হাতে কলমে বিজ্ঞান : বায়ুর চাপ

যে জল পড়ে না

❐ কী কী লাগবে

1. একটি প্লাস্টিকের গ্লাস, যার নীচে একটি ফুটো আছে।
2. একটি পোস্টকার্ড বা কার্ডবোর্ড।
3. এক বালতি জল।

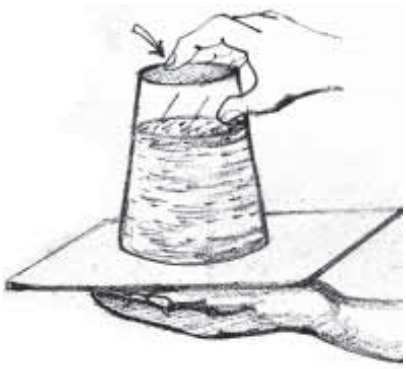

❐ কী করতে হবে

1. গ্লাসে জল নাও এবং নীচের ফুটো ডানহাতের তর্জনী দিয়ে বন্ধ করো এবং গ্লাসটিকে ধরো।
2. শক্ত কার্ডটি দিয়ে গ্লাসের মুখ বন্ধ করো এবং বাঁ হাত দিয়ে কার্ডটি চেপে ধরো।
3. এরপর ফুটোটাকে বন্ধ রাখা অবস্থায় গ্লাসটিকে উলটে দাও এবং আস্তে করে কার্ড থেকে বাঁ হাত সরিয়ে নাও। দেখবে যে, জল পড়বে না।
4. এবার ফুটো থেকে ডান হাতের তর্জনী সরিয়ে নাও। দেখবে কার্ড এবং জল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে পড়ে যাবে।

❐ ছাত্র-ছাত্রীরা কী জানবে

1. তুমি যখন ফুটোটা বন্ধ রেখে কার্ডের নীচে থেকে হাত সরিয়ে নিলে, তখন জল পড়ে গেল না কেন?

2. ফুটো থেকে হাত সরিয়ে নিলে জল পড়ে গেল কেন?

❐ ব্যাখ্যা

1. ফুটো বন্ধ রেখে যখন হাত সরানো হচ্ছে তখন কার্ডটি একটু নীচে নেমে আসবে। ফলে জলের ওপরে যে বাতাস আছে তা প্রসারিত হয়ে তার চাপ কমে যাবে। নীচে থেকে কার্ডের ওপর বায়ুর যে চাপ কাজ করছে তা জল ও জলের ওপরে যে প্রসারিত বায়ু আছে তার চাপের চেয়ে বেশি। তাই ওপরের দিকে একটি ঊর্ধ্বচাপ কাজ করে, যা জলকে পড়তে দেয় না।
2. ফুটো থেকে আঙুল সরিয়ে নিলে জলের ওপরে যে বায়ু ছিল তা বাইরের বায়ুর সংযোগে আসে। এর ফলে কার্ডের নীচে থেকে বায়ু চাপ এবং গ্লাসের মধ্যে জলের ওপরে বায়ুর চাপ সমান হয়ে যায়। ফলে জলের ওজনে কার্ড ও জল দুই-ই পড়ে যায়।

বাতাস ছাদ উড়িয়ে দেয়

❐ কী কী লাগবে

1. একটি 7″ × 5″ কার্ড।
2. সেলোটেপ।

❐ কী করতে হবে

1. কার্ডটিকে সমান দুটি ভাগে ভাগ করো। পুরো দৈর্ঘ্য বরাবর দুটি কার্ডের মধ্যে একটু ফাঁক রেখে সেলোটেপ দিয়ে জুড়ে দাও।
2. দুই হাত দিয়ে একটি কার্ডের দুই প্রান্ত ধরে অপর কার্ডের ওপর দিয়ে অনুভূমিকভাবে (Horizontal) ফুঁ দাও। দেখবে যে, সেই কার্ডটি ওপরে উঠে যাচ্ছে।

❐ ছাত্র-ছাত্রীরা কী জানবে

1. কার্ডটি ওপরে উঠে যাচ্ছে কেন?
2. দৈনন্দিন জীবনে এই ঘটনা আমরা কোথায় দেখি?

❐ ব্যাখ্যা

1. বহতা বা বয়ে যাওয়া বাতাসের চাপ কম হয়। একে বারনৌল্লি (Bernoulli) ধর্ম বলে। যখন কার্ডের ওপর দিয়ে হাওয়া বয় তখন সেখানে চাপ কমে যায়। কিন্তু কার্ডের নীচে সাধারণ বায়ুর চাপ কাজ করে। এই চাপ ওপরের চাপের চেয়ে বেশি হওয়ার ফলে কার্ডটি ওপরে উঠে যায়।

2. যখন প্রচণ্ড ঝড় হয় তখন টিন বা অ্যাসবেস্টাসের ছাদ উড়ে যাওয়ার খবর আমরা পড়ি। ছাদের ওপর দিয়ে হাওয়া বইলে চাপ কমে যায়। অথচ ঘরের ভেতরে থাকে সাধারণ বায়ুর চাপ। এই চাপের পার্থক্যের ফলেই ছাদ উঠে যায়। সেজন্য ছাদকে ভালভাবে কড়িকাঠের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হয়।

Email : samar.bagchi@yahoo.com, M. 9433526839

ক ম ল ব কা শ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

আগুন কাঠি

ছবি : তাপস মজুমদার

মানুষ কবে আগুন আবিষ্কার করেছিল তা জানা নেই। তবে আগুন ব্যবহারের প্রথম পাঠ যে সে প্রকৃতির কাছ থেকে নিয়েছিল সেটা ধরে নেওয়া যায়। সম্ভবত দাবানল থেকেই আগুনের সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয়। দাবানল শুরু হলে পশু, পাখিরা প্রাণভয়ে পালাতে শুরু করে। মাইলের পর মাইল বনভূমি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এইসব দেখে জঙ্গলের মানুষ একদিন বুঝেছিল যে একে আয়ত্ব করতে পারলে সবার উপর প্রভুত্ব করা যাবে। আগুনকে কীভাবে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে শুরু হল অনুসন্ধান। ক্রমে ক্রমে মানুষ শিখল যে কাঠে কাঠে ঘষাঘষি করে বা পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি করে আগুন জ্বালানো সম্ভব।

আগুন তো জ্বললো। কিন্তু তাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে কীভাবে? নিরন্তর প্রচেষ্টায় মানুষ সেটাও আয়ত্ব করে ফেলল। শুধু তাই নয়, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আগুনকে একেবারে পকেটে পুরে ফেলল।

আগুন নিয়ে গ্রিক পুরাণে একটা গল্প আছে। গ্রিক দেবতা 'প্রমিথিয়ুস' স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনে মানুষকে দিয়েছিলেন। আগুন হাতে পেয়ে মানুষ হয়ে উঠল অমিত শক্তিধর। চুরির দায়ে প্রমিথিয়ুসকে কঠিন শাস্তি পেতে হয়েছিল। কল্পকথা যাই হোক না কেন, আগুন যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব এমন ধারণা মানুষের প্রাচীনকাল থেকেই ছিল।

আগেই বলেছি, মানুষ প্রথম দিকে আগুন জ্বালাতো কাঠেকাঠে ঘষাঘষি করে অথবা পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি করে। এভাবে অবশ্য চটজলদি আগুন জ্বালানো যেত না। সেটা সম্ভব হল যখন ফসফরাস মৌলটির ব্যবহার মানুষ শিখল। এই মৌলটি বাতাসের সংস্পর্শে এলেই জ্বলে ওঠে। চটজলদি আগুন জ্বালানো তো সম্ভব হল, তবে একে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া তখনও কষ্টকর ব্যাপার ছিল। এই সমস্যা সমাধানে রসায়নের অবদান অনস্বীকার্য।

পটাশিয়াম ক্লোরেট ও চিনির মিশ্রণ সালফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে জ্বলে ওঠে। রসায়ন বিজ্ঞানের এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে 'চ্যানসেল' ১৮০৫ সালে প্রথম দেশলাই উদ্ভাবন করেন। যদিও সেই দেশলাই আধুনিক দেশলাই-এর আগুন কাঠির এক জায়গায় কিছুটা মিল আছে, তা হল— কাঠির মাথায় বারুদ। আগুন কাঠি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও, নিরাপত্তার দিক থেকে কিছুটা অনিশ্চয়তা ছিল। কারণ আগুন কাঠির সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের শিশিও বয়ে নিয়ে যেতে হত। অসাবধানতার কারণে এই অ্যাসিডের শিশি মাঝে মাঝেই বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতো।

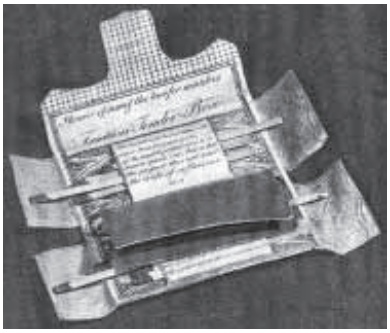

আগুন কাঠির ডগায় যে মশলা লাগানো হত তার উপাদানের হেরফের ঘটিয়ে ১৮৮৯ সালে আর এক ধরনের কাঠি তৈরি করা হল যা জ্বালাতে সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রয়োজন হত না। এই কাঠি শিরীষ কাগজে ঘষলেই কাঠির ডগায় লাগানো বারুদ জ্বলে উঠত। কাঠির মাথায় যে মশলা লাগানো হত তাতে থাকত পটাশিয়াম ক্লোরেট, চিনি, অ্যান্টিমনি সালফাইড ও গঁদ। এই দেশলাইকেই আধুনিক দেশলাই-এর জনক বলা যেতে পারে। এরপর বাজারে এল লুসিফার দেশলাই (Lucifer Match)। এর কাঠির ডগায় যে বারুদ লাগান হত তা তৈরি হত গলন্ত গন্ধক, সোডা, সাদা ফসফরাস, পটাশিয়াম ক্লোরেট এবং গঁদ দিয়ে তৈরি মিশ্রণ থেকে। এই কাঠি জ্বালাতে কোনো শিরীষ কাগজের প্রয়োজন হত না। যেকোনো খরখরে জিনিসে কাঠির ডগায় লাগানো বারুদ ঘষলেই আগুন জ্বলে উঠত। ঘর্ষনের ফলে যে উত্তাপ সৃষ্টি হত তাতে ফসফরাসে আগুন ধরে যেত, তারপর সোডা থেকে অক্সিজেন বের হয়ে গন্ধককে জ্বালিয়ে তুলত। লুসিফার দেশলাই ব্যবহারে যেমন সুবিধা ছিল তেমন অসুবিধাও ছিল। এই কাঠিগুলির সঙ্গে অন্য কোনো

জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে হত না ঠিকই, তবে কাঠিগুলি পকেটে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক ছিল। কারণ জামার সঙ্গে ঘষা লেগেও অনেক সময় কাঠিগুলি জ্বলে উঠত। এছাড়াও এই দেশলাই তৈরিতে ফসফরাস ব্যবহারের জন্য শ্রমিকদের নানা ধরনের কঠিন অসুখ হত। এ যেন অনেকটা আলাদীনের প্রদীপ, মানুষের হাতে এসেও আসছে না। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মশলার উপাদানে আরও কিছু রদবদল ঘটিয়ে

তৈরি করা গেল নিরাপদ দেশলাই (Safety Match)। এই দেশলাই-এর কাঠির ডগায় লাগানো বারুদের মশলায় থাকে লাল ফসফরাস, অ্যান্টিমনি সালফাইড, পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট অথবা রেডলেড এবং গঁদ। লাল ফসফরাস সাদা ফসফরাসের তুলনায় নিরাপদ এবং কম বিষাক্ত। কাঠিগুলিকে কখনও কখনও তরল সোহাগায় (Borex) ডুবিয়ে নেওয়া হয়। এই দেশলাই-এর বৈশিষ্ট্য হল কাঠিগুলিকে একটি ছোটো পাতলা কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা হয়। এই বাক্সের দু'পাশে লাল ফসফরাস, অ্যান্টিমনি সালফাইড, গুঁড়ো কাঁচ এবং গঁদের প্রলেপ দেওয়া থাকে। কাঠির ডগায় লাগানো বারুদ এই প্রলেপের উপর ঘষলেই আগুন জ্বলে ওঠে। বাক্সের মধ্যে থাকাকালীন এই কাঠিগুলিতে আগুন জ্বলার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এছাড়াও আরও এক ধরনের দেশলাই আছে যার কাঠিগুলি কোনো অমসৃণ জায়গায় ঘষলেই জ্বলে ওঠে। তবে জামার পকেটে থাকাকালীন আগুন জ্বলে না। এই দেশলাইকে বলা হয়, 'যে কোনো জায়গায় ঘষা দেশলাই' (Strike any where matches)।

এত কান্ড করে যে ছোট্ট বাক্সটার মধ্যে আগুনকে বন্দি করা গেল সেই বাক্সটাই নাকি পরিবেশে দূষণ ছড়াচ্ছে— এমনই অভিযোগ পরিবেশবিদদের। এক সময় দেশলাই-এর মশলা তৈরির অন্যতম উপাদান ছিল গন্ধক। গন্ধক যখন পোড়ে তখন বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে, যা থেকে পরিবেশ দূষিত হয়। প্রতিদিন পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ দেশলাই কাঠি পোড়ান, এর ফলে উৎপন্ন হয় বিপুল পরিমাণ গ্যাস। পরিবেশবিদদের মতে এই গ্যাস অ্যাসিড বৃষ্টির অন্যতম কারণ। তাই ইদানীং তৈরি হচ্ছে গন্ধক-বিহীন দেশলাই। সম্প্রতি ব্রিটেনে এমনই একটি দেশলাই তৈরি হয়েছে যার মশলা তৈরিতে গন্ধকের পরিবর্তে ফেরো-ফসফরাস ব্যবহার করা হয়েছে।

হাল আমলে দু'ধরনের দেশলাই বাজারে বেশি দেখা যায়— পাতলা কাঠের বাক্সের দেশলাই এবং পেস্ট বোর্ডে তৈরি বাক্সের দেশলাই। এতে যে কোনো এক ধরনের কাঠি থাকতে পারে :

১। কাঠের পাতলা চাদর কেটে তৈরি কাঠি।

২। প্যারাফিনে চোবানো কাগজে দিয়ে তৈরি কাঠি।

এই কাঠিগুলির ডগায় যে মশলা থাকে তাতে পটাশিয়াম ক্লোরেট, লেড-অক্সাইড, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড, কাঁচের গুড়ো, ডেকস্ট্রিন জাতীয় আঠা এবং রঙ থাকে। বাক্সের দু'পাশে যে মিশ্রণের প্রলেপ লাগানো হয় তাতে থাকে লাল ফসফরাস, কাঁচের গুঁড়ো এবং গঁদ। কাঠিগুলির ডগায় মশলা লাগানোর আগে অনেক সময় এগুলিকে সোডিয়াম সিলিকেট এবং অ্যামোনিয়াম ফসফেটের দ্রবণে ডুবিয়ে নেওয়া হয়, যাতে কাঠিগুলি ভালোভাবে জ্বলতে পারে। ইদানীং দেশলাই-বাক্সের গায়ে 'কার্বোরাইজড' শব্দটি লেখা থাকে। এই ধরনের দেশলাই-এর বিশেষত্ব হল এর কাঠিগুলি জ্বলার সময় আগুনের ফুলকি ছিটকে যায় না এবং কাঠি জ্বলার পর ভেঙে পড়ে না।

Email : kbb.scwriter@gmail.com, M. 9433145112

অনুলিখন : ড: সিদ্ধার্থ জোয়ারদার *অঙ্কন : জুয়েল হালদার*

অঙ্কিতা সেনগুপ্ত

টাউ না পাই কোথায় যাই

সেই কোন সুদূর অতীত থেকে সিংহাসনে বসে সুখে রাজত্ব করছেন রাজা। তাঁকে নিয়ে নেই বিস্ময়ের অন্ত। মুগ্ধ সবাই তাঁর গুণে। কিন্তু হঠাৎ শুরু হল বিদ্রোহ। একদল বলে বসল, সিংহাসন আসলে রাজার নয়, রাজার বড় ভাইয়ের। অতএব, হঠাও রাজাকে। রাজার সমর্থকও তো কম নয়। তারাই বা মানবে কেন? আর কী? শুরু হল যুদ্ধ।

হ্যাঁ, ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়েছে, গ্রীক বর্ণমালার ১৬তম ও ১৯তম বর্ণ দুটির মধ্যে; অর্থাৎ π (পাই) ও τ (টাউ)-এর মধ্যে। তাদের রণাঙ্গনটি হল অঙ্কের পৃথিবী। যে পৃথিবীতে কিনা π-এর বিচরণ অবাধ। এতটাই জনপ্রিয় সে যে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের একটি দিন 'পাই দিবস' নামেই পালন করা হয় 14ই মার্চ বা 3.14 অর্থাৎ দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর আসন্ন মান। π-এর মহিমার সঙ্গে জুড়ে আছে আর্কিমিডিস, ফিবোনাচ্চি, নিউটন, রামানুজ-প্রমুখ সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞদের নাম। জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, সংখ্যাতত্ত্ব— কোথায় নেই এই অমূলদ সংখ্যাটি!

এহেন π-কে কিনা বলা— 'π is wrong'? অতএব সরাও π-কে। যথোচিত সম্মান দেওয়া হোক τ-কে— এই দাবি নিয়েই শুরু 'টাউ আন্দোলন', যার অন্যতম প্রতীক 'টাউ দিবস' অর্থাৎ 28শে জুন বা 6.28 যা কিনা দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত τ-এর আসন্ন মান।

মান দেখেই বোঝা যাচ্ছে $\tau = 2\pi$। π হল বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত ধ্রুবক এবং τ হল বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসার্ধের অনুপাত ধ্রুবক। আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে গণিতজ্ঞ Palais লেখা, 2001 সালের একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে যার শীর্ষক 'π is wrong!' প্রবন্ধটিতে তিনি লেখেন, '... π is wrong... The proper value, which does deserve all of the reverence and adulation bestowed upon the current imposter, is the number now unfortunately known as 2π.'

এরপর এই আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ Michael Hart 28শে জুন 2010-এ অর্থাৎ একটি 'টাউ দিবস'-এ প্রকাশ করেন 'Tau Manifesto'। যেখানে তাঁর স্পষ্ট কথা, 'π is a confusing and unnatural choice for the circle constant.'

Hart অবশ্যই τ-ব্যবহারের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেন। পরবর্তীকালে টাউ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হল Vi Hart, Kevin Houston প্রমুখ। তাঁদের যুক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিদ্যালয়ে শেখা কিছু সংজ্ঞা।

প্রথমেই আসা যাক, বৃত্তের সংজ্ঞায়। 'বৃত্ত হল একটি সমতলে অসংখ্য বিন্দু সমষ্টি যারা প্রত্যেকে ওই সমতলের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সমদূরবর্তী।' বলাই বাহুল্য, নির্দিষ্ট বিন্দুটি হল বৃত্তের কেন্দ্র এবং যে দূরত্বের কথা সংজ্ঞায় বলা হয়েছে তা হল ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য।

কী আশ্চর্য! বৃত্তের সংজ্ঞায় গুরুত্ব পাচ্ছে ব্যাসার্ধ। অথচ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত π-কে; বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসার্ধের অনুপাত τ-কে নয়। এখানেই আপত্তি টাউ সমর্থকদের।

নিজেদের স্বপক্ষে তাঁরা আরও একটি যুক্তি দেখিয়েছেন, যেটি সহজ করে বললে সামনে চলে আসে বিদ্যালয়েতেই শেখা ত্রিকোণমিতির অঙ্ক বৃত্তীয় পদ্ধতিতে কোণের পরিমাপ।

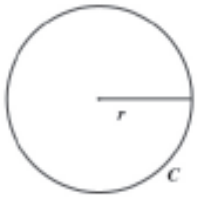

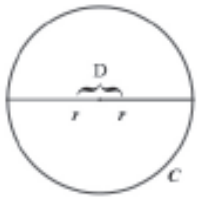

ধরা যাক, কোনো ঘূর্ণায়মান রশ্মি তার প্রাথমিক অবস্থান থেকে প্রান্তবিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে একপাক ঘুরে পূর্ব অবস্থানে ফিরে এসেছে। এক্ষেত্রে কোণের বৃত্তীয় পরিমাপ হবে 2π রেডিয়ান।

কিন্তু এই ব্যাপারটিই পছন্দ নয় টাউবাদীদের। আবর্তন হচ্ছে পুরো 1 বার, আর লিখতে হবে 2π! একই ভাবে, রশ্মিটার যদি আগের

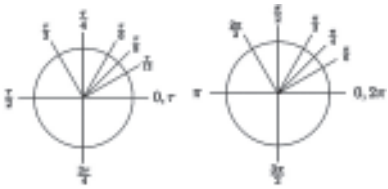

½ ভাগ পরিমাণ ঘোরে লিখতে হবে π, তারও অর্ধেক অর্থাৎ 1 পাকের $\frac{1}{4}$ ভাগ ঘুরলে লিখতে হবে $\frac{\pi}{2}$। π-এর বদলে τ ব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট পরিমাপগুলি হতো যথাক্রমে τ, $\frac{\tau}{2}$ ও $\frac{\tau}{4}$। এই ধরনের গণনা মনে রাখা অনেক সহজ। তাই τ-এর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত শ্রেয় বলেই টাউপ্রেমীদের অভিমত।

টাউবাদীদের এই আন্দোলন যতই জোরদার হোক না কেন π-কে সরানো কী এতই সোজা? সারা পৃথিবী জুড়ে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে π। তাকে সরাতে গেলে যে আরেক ধুন্ধুমার কান্ড বাধবে তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া পাই সমর্থকদের মতে π-এর ব্যবহার বন্ধ করার কোনো গাণিতিক যুক্তিই নেই। TIFR-এর প্রাক্তন অধ্যাপক M. S. Raghunathan-এর ভাষায়, 'The only benefit I see is that you could write one symbol (tau) instead of two symbols (2 pi) and save ink-nothing more than that.'

π-সমর্থকদের মতে এই আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন। বরঞ্চ হঠাৎ করে π-এর পরিবর্তে τ-এর ব্যবহারই ধন্দের সৃষ্টি করবে। π-এর ব্যবহারের সঙ্গেই সকলে অভ্যস্ত এবং π-এর সঙ্গে 2 গুণ করা কোন সাঙ্ঘাতিক পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার নয়। অতএব π-কে সরানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে

না। পাইবাদীরা অবশ্য শুধুমাত্র π-এর বহুল ব্যবহারকেই তাদের স্বপক্ষের যুক্তি হিসেবে রাখছেন না। গণনার ক্ষেত্রে π-ব্যবহারের সুবিধারও প্রমাণ তারা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা শরণাপন্ন হয়েছেন একক ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্ত অর্থাৎ Unit Circle-এর ক্ষেত্রফলের। প্রসঙ্গত গণিতে Unit Circle-এর গুরুত্বও কিছু কম নয়। তাই তার ক্ষেত্রফলও ফেলনা নয়।

সামান্য গণনার সাহায্যে অনুধাবন করা সম্ভব যে সম্পূর্ণ Unit Circle-এর ক্ষেত্রফল π বর্গএকক। তার অর্ধেকের ক্ষেত্রফল $\frac{\pi}{2}$ বর্গএকক। তারও অর্ধেক অর্থাৎ সম্পূর্ণ বৃত্তটির $\frac{1}{4}$ ভাগের ক্ষেত্রফল $\frac{\pi}{4}$ বর্গএকক। কিন্তু π-এর বদলে τ ব্যবহার করলেই সংশ্লিষ্ট মানগুলি হত যথাক্রমে $\frac{\tau}{2}$, $\frac{\tau}{4}$ ও $\frac{\tau}{8}$ যা মোটেই সুবিধাজনক হত না।

অর্থাৎ গণনায় সুবিধার অজুহাত π-এর প্রচলন বন্ধ করার পক্ষে যথেষ্ঠ নয়।

শুধু কী তাই। যদি প্রশ্ন করা হয় ত্রিভুজের তিনটি অন্তঃকোণের পরিমাপের সমষ্টি কত? কোন উত্তরটি বেশি গ্রহণযোগ্য হবে π না $\frac{\tau}{2}$। একই প্রশ্ন n-সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের অন্তঃকোণের পরিমাপের সমষ্টির ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক : $(n-2)\pi$ না $(n-2)\tau/2$?

এত গেল গাণিতিক যুক্তিতর্কের ব্যাপার। সব থেকে লক্ষণীয় বিষয় হল; Palais-এর যে প্রবন্ধ থেকে এতো কান্ড শুরু সেখানে তাঁরই বক্তব্য, 'I do not necessarily feel that π can or even should be changed or replaced with an alternative...'

একথা ঠিক, যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সূত্রে 2π ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন Cauchy's Integral Formula বা Fourier Series Formula, যেখানে টাউবাদীরা 2π-এর বদলে τ-এর প্রচলন সমর্থন করেন। কিন্তু একথাও সত্য যে Gaussian Integral বা Cauchy Distribution ইত্যাদির সূত্রে π ব্যবহৃত হয়েছে। তাই π-এর আমূল পরিবর্তন অবশ্যই অসুবিধাজনক।

অতএব τ না π-কার কদর বেশি হওয়া উচিত তা নির্ণয় করা সত্যিই বিতর্কসাপেক্ষ। যদিও অনেকে একে বিতর্ক বলতেও রাজি নন। অনেকে আবার এই বিতর্কে অংশগ্রহণও করছেন।

সত্যি কথা বলতে, দীর্ঘকালীন প্রচলিত একটি ধারণার পরিবর্তন সহজ নয়, যেখানে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাই প্রশ্নের মুখে। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, যুগযুগান্ত ধরে বিভিন্ন বিতর্কই অনেক সময় মানবসভ্যতার দিক নির্ণয় করেছে। প্রশ্ন-উত্তর, যুক্তি পাল্টা যুক্তিই তো মানুষকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখায়। এখন, একবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে জন্ম নেওয়া টাউ-পাই বিতর্ক ভবিষ্যৎ সভ্যতার কোনো নতুন সোপান রচনা করবে কিনা তা জানার জন্য অপেক্ষা করা যেতেই পারে আগামীর পথ চেয়ে।

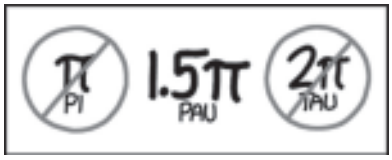

Email : ankitasengupta57@gmail.com, M. 9748685280

রা জা রা উ ত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

ঘড়িয়াল

সাধারণ ইংরাজি নাম : Gharial

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Gavialis gangeticus*

দৈর্ঘ্য গড়ে : ৬ মি. (১৮ ফুট)। ভারতে প্রাপ্ত ৩ জাতের কুমীরের মধ্যে এটি একটি। মুখের ঠোঁটের ওপর অংশে 'ঘড়া' নামক ফোলা অংশ রয়েছে যার জন্য 'ঘড়িয়াল' নামটি।

বর্তমান অবস্থা : সাম্প্রতিক কালের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী এরা পাকিস্তান, ভুটান, বাংলাদেশ এবং মায়ানমার থেকে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত। ভারত ছাড়া কেবলমাত্র গুটিকয়েক নেপালেই পাওয়া যায়।

উন্নয়নের সাথে সাথে নদীগুলোতে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, আবাসস্থল ধ্বংস এবং অবৈধ ভাবে মাছ শিকারের কারণে এরা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। ভাবলে অবাক হতে হয় যে, এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে ১৮০টি কিংবা তার চেয়েও কম সংখ্যায় এরা বেঁচে থাকার শেষ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বস্তুতপক্ষে, ডোরাকাটা বাঘের চাইতেও ২০ গুণ অধিক বিপন্ন।

সংরক্ষণ : সত্তরের দশক থেকে বিভিন্নভাবে ভারত সরকার সংরক্ষণের জন্য নানা কর্মসূচি নিলেও সেইভাবে সফল হওয়া যায়নি। তৈরি করা হয়েছে Gharial Multi Task Force (GMTF)। Madras Crocodile Bank Trustকে সামনে রেখে ঘড়িয়াল বাঁচানোর অ্যাক্সন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে।

Email : rajarouthbhb@gmail.com, M. 9474417178

অ মি তা ভ চ ক্র ব র্তী

নতুন গবেষণার অলিন্দে

কোষের নিউক্লিয়াস নির্ধারণ করবে আপনি কতদিন বেঁচে থাকবেন

জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইন্সটিটিউট ফর বায়োলজির একদল গবেষক পরীক্ষা করছিলেন এক বিশেষ প্রজাতির ক্রিমি (worm)-র জীবনকাল নিয়ে। সাধারণতঃ এরা গড়ে ২২ দিন বেঁচে থাকলেও বিশেষভাবে পরিবর্তিত জিন সম্পন্ন একই প্রজাতির অন্য প্রাণীটি বেঁচে রইল ৪৬ দিন। কারণ খুঁজতে গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারলেন শারীরবৃত্তিয় বিপাকক্রিয়াই আসলে তাদের বেঁচে থাকার কাল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর এই প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অবদান হল কোষের নিউক্লিয়াসের।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে জীবিত কোষকে দেখলে তার মধ্যে গাঢ় গোলাকার নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি সহজেই চিহ্নিত করা যায়। প্রাণী, উদ্ভিদ এমনকি ছত্রাকের দেহকোষেও নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াসই কোষের সমস্ত রকম কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। আর এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকা নিউক্লিওলাসকে কোষের রাইবোজোম ফ্যাক্টরি বলা যেতে পারে। রাইবোজোম হল কোষে প্রোটিন তৈরির মাইক্রোমেশিন। প্রোটিন কেবলমাত্র কোষের পর্দাই তৈরি করে না, দেহকোষের বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোষকে পুরোপুরি সক্রিয় রাখে। যদি একটি বাড়ি তৈরির সঙ্গে একটি কোষের নির্মাণের তুলনা করা যায় তবে বলতে হয় DNA-তে থাকে কাজের ব্লু-প্রিন্ট, আর নিউক্লিওলাসের ভূমিকা যেন অনেকটা ইঞ্জিনিয়ারের মতো। কত ভালোভাবে এরা এই নির্মাণকার্য সম্পন্ন করতে পারে তার ওপর কোষের স্বাস্থ্য ও আয়ু নির্ভর করে। তাই কোনো কোষে উপস্থিত নিউক্লিয়াসের আকারের উপর কোষের জীবনকাল অনেকাংশে নির্ভরশীল বলে মনে করা হয়। প্রাপ্ত পুষ্টি এবং বেড়ে ওঠার সংকেতের ওপর নির্ভর করে নিউক্লিওলাসের সক্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় ও তারপর আবার কমে আসে। বেড়ে ওঠার সংকেত জোরালো হলে নিউক্লিওলাস বেশি করে রাইবোজোম তৈরি করে ও আকারে বড় হয়। এই ঘটনায় কোষের আয়ু কমে যায়। আবার যদি পুষ্টির যোগান কমে আসে তবে কোষের জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি ধীরে চলতে থাকে। এই সময় নিউক্লিওলাস তথা নিউক্লিয়াসকেও কম রাইবোজোম তৈরি করতে হয় এবং কোষের জীবনকাল বৃদ্ধি পায়।

র‍্যাপামাইসিন নামক এক রাসায়নিকের উপস্থিতি কোষের একটি নির্দিষ্ট বিপাক ক্রিয়াকে বিঘ্নিত করায় ইঁদুর, কৃমি, মাছি এবং ঈস্টের জীবদ্দশা দীর্ঘায়িত হয়। এদের ক্ষেত্রেও কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে নিউক্লিওলাস তথা নিউক্লিয়াসের আকার তুলনামূলক ছোটো। গবেষকদের আশা তাদের এই আবিষ্কার হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, এইডস প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

রোবোট রসায়নবিদ

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল রসায়নবিদ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবোটকে এমনভাবে ট্রেনিং দিয়েছেন যে সেটি অনায়াসে খুব বড়ো ও জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া অনুসন্ধান করতে সক্ষম। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই রোবোট যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোনো নির্দিষ্ট রাসায়নিক পরিমন্ডলের কথা বিবেচনা এবং জটিল গাণিতিক পরিভাষা ব্যবহার করে নতুন কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া এমনকি নতুন অণু তৈরি করতেও সক্ষম।

সম্প্রতি এই গবেষকদলের সদস্যরা প্রারম্ভিক অণু হিসাবে ১৮টি নতুন রাসায়নিক ব্যবহার করে প্রায় হাজার রকমের বিক্রিয়া অনুসন্ধান করেছেন। অবশেষে তাঁদের প্রশিক্ষিত রোবোট এদের মধ্যে থেকে খুঁজে পেয়েছে মোটামুটি ১০০টি সম্ভাব্য রাসায়নিক বিক্রিয়া। ওনারা সন্ধান পেয়েছেন অনেকগুলি অজানা অণুর। গবেষকদলের প্রধান অধ্যাপক লি ক্রনিন মনে করেন এইভাবে রোবোটকে ব্যবহার করে খুব কম খরচে ও স্বল্প সময়ে নতুন নতুন অণু তৈরি করা সম্ভব হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞান সহ নানা রকম প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকে এই অণুগুলি হয়তো অদূর ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

Email : acnbu13@gmail.com, M. 9434377067

অ নি ন্দ্য দে

অপূর্ণতার প্রশস্তি : এক দীর্ঘ জীবনের উপাখ্যান

৩০ থেকে ৪০ লক্ষ কোটি কোশের সমাবেশ আমাদের এই দেহে। কিন্তু সে যাত্রা তো শুরু হয়েছিল একটা মাত্র আদি কোশ থেকেই। তার মধ্যেই ধরা ছিল আমাদের সমগ্র সত্ত্বার যাবতীয় তথ্য, আমাদের জিনগত সংকেত। ক্রমে ক্রমে সেই কোশ থেকে তৈরি হল আরও কিছু কোশ। তারা আবার বিভাজিত হয়ে তৈরি করল আরও কিছু। এভাবেই ক্রমশ বাড়তে বাড়তে সংখ্যাটা পৌঁছে গেল কয়েক লক্ষ কোটিতে। প্রথম দিকে অবশ্য আদি কোশ থেকে যে কোশগুলো তৈরি হয়েছিল, বা তার পরের কয়েকটা প্রজন্মের কোশের সঙ্গে আদি কোশের কোনও ফারাক ছিল না। কিন্তু আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে শুরু হল একের সঙ্গে অপরের চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে 'ডিফারেন্সিয়েশন'। তবে এসব ব্যাপারগুলো আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়, অনেকদিন আগে থেকেই এসব আমাদের জানা। বিভাজনের ফলে কিভাবে কোশের সংখ্যা ক্রমশ : বাড়তে থাকে, কিভাবে ডিফারেন্সিয়েশন ঘটে, বিজ্ঞানীরা তার খোঁজ পেয়েছিলেন অনেকদিন আগেই। কিন্তু এই বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয় কিভাবে, কেন অনন্তকাল ধরে ভাঙ্গতে থাকে না একের পর এক কোশ, জানা ছিল না সেটাই। বিশ শতকের পাঁচ-এর দশকে এসে প্রথম এব্যাপারে আমাদের চোখ খুলে দিলেন ইতালীয় জীব-বিজ্ঞানী রিটা লেভি মন্টালসিনি।

রিটা লেভি মন্টালসিনি

অথচ পড়াশোনা করার জন্য কম লড়াই করতে হয়নি এই রিটাকে। ইতালির তুরিন শহরের এক শিক্ষিত অথচ রক্ষণশীল পরিবারে তার জন্ম ১৯০৯ সালের ২২ এপ্রিল। বাবা অ্যাডামো লেভি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হলেও ভাবনা-চিন্তায় ছিলেন যথেষ্টই গোঁড়া। তার ধারণা ছিল সংসারে স্ত্রী এবং মা হিসেবে মেয়েদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, কেরিয়ার গড়তে গেলে সে জায়গাটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই রিটা ও তার যমজ বোন পাওলো, এবং তাদের দিদি অ্যানাকে উচ্চশিক্ষা এবং পেশাগত জগৎ থেকে দূরে রাখতেই চেয়েছিলেন তাদের বাবা। কিন্তু কৈশোর পেরিয়ে এসে রিটা বুঝতে পারলেন যে বাবার ভাবনার মত করে সংসারে শুধুমাত্র স্ত্রী বা মায়ের ভূমিকা পালন করে যাওয়া বোধ হয় তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সাহস করে পেশাগত জগতে প্রবেশের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার অনুমতি চাইতে গেলেন বাবার কাছে। অদ্ভুতভাবে অনুমতি পেয়েও গেলেন। শুরু হল এক রোমাঞ্চকর দীর্ঘ যাত্রা।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ভর্তি হলেন তুরিনের মেডিক্যাল স্কুলে। ১৯৩৬ সালে সেখান থেকে মেডিসিন ও সার্জারিতে স্নাতক হয়ে নাম লেখালেন স্নায়ুবিদ্যা ও মনস্তত্ত্বের স্পেশাল কোর্সে। কিন্তু শুরু হল এক নতুন দ্বন্দ্ব। সামনে দুটো রাস্তা খোলা। চিকিৎসক হিসেবে কাটিয়ে দিতে পারেন সারাটা জীবন; আবার স্নায়ুবিজ্ঞানের গভীর গবেষণায় ডুবে যাওয়ার পথও উন্মুক্ত। কোন্ রাস্তাটা বাছবেন রিটা? না, খুব বেশি ভাবতে হয়নি তাকে। উত্তাল সময়ের আবর্তে পড়ে অচিরেই অবসান হল দ্বন্দ্বের।

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা। ইটালির সর্বাধিনায়ক মুসোলিনি প্রকাশ করেছেন তার ঐতিহাসিক ম্যানিফেস্টো। তাতে আবার দশজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর স্বাক্ষর। ইতালিতে বসবাসকারী অনার্য রক্তের সমস্ত মানুষকে শিক্ষাদীক্ষা এবং পেশাগত জগৎ থেকে ছেটে ফেলার যাবতীয় বন্দোবস্ত রয়েছে সেই ম্যানিফেস্টোয়। সেসময়ে রিটা আর তার পরিবারের লোকজনের উপায় ছিল আমেরিকায় পালিয়ে যাওয়ার। কিন্তু তারা তা করলেন না। সিদ্ধান্ত নিলেন আর্য সমাজের সঙ্গে কোনো সংযোগ না রেখে, সেই সমাজের কোনও সহায়তা ছাড়াই কাজ করে যেতে হবে ইটালির মাটিতে। তাই নিজের শোবার ঘরে ল্যাবরেটরি বানিয়ে গভীর গবেষণায় ডুবে গেলেন রিটা।

১৯৪১ সাল। যুদ্ধের আগুন গ্রাস করে ফেলেছে সারা পৃথিবীকে। নিরন্তর বোমার আক্রমণ থেকে বাঁচতে পরিবারের লোকজনকে নিয়ে তুরিন শহর ছেড়ে রিটা পালালেন গ্রামে। কিন্তু সেখানেও শান্তি নেই। ১৯৪৩ সালে ধেয়ে এল জার্মান সেনার দল। পালাতে হল ফ্লোরেন্সে। তবে সে যাত্রায় রক্ষে পেয়ে গেলেন অল্প সময়ের মধ্যেই। অ্যাংলো-আমেরিকান সেনার তাড়ায় জার্মান সেনারা পালাতেই চিকিৎসক রিটার ডাক পড়ল শরণার্থী শিবিরে। মৃত্যু যেখানে প্রতি মুহূর্তে চোখ রাঙাচ্ছে, সেখানে যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা করে চললেন দিনের পর দিন। ১৯৪৫-এ যুদ্ধের শেষে ফিরলেন তুরিনে। যোগ দিলেন তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ডাক পেলেন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিক্টর হামবার্গারের কাছ থেকে। বেশ কয়েক বছর আগে অধ্যাপক হামবার্গার মুরগির ভ্রূন নিয়ে যে পরীক্ষাগুলো করেছিলেন সেগুলোকেই আবার নতুন করে দেখার জন্য তিনি ডেকেছেন রিটাকে। রাজি হলেন রিটা। পরিকল্পনা ছিল এক বছর পরে ফিরে আসবেন তুরিনে। কিন্তু তা আর হল না। কেটে গেল তিরিশটা বছর। রিটার জীবনের উজ্জ্বলতম তিরিশটা বছর।

হামবার্গারের ল্যাবরেটরিতে গবেষণার বিষয় হিসেবে রিটা বেছে নিলেন স্নায়ুকোশকে। সেসময়ে স্নায়ুকোশগুলোর বৃদ্ধি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সে ব্যাপারেও কোনও ধারণাই আমাদের ছিল না। রিটা নামলেন তার উত্তর খুঁজতে। ইঁদুরের শরীর

থেকে টিউমার কোশ তুলে এনে রিটা প্রতিস্থাপন করলেন মুরগির ভ্রূণে। দেখলেন ওই ভ্রূণের স্নায়ুকোশের, বিশেষ করে দেহের বাইরের থেকে দেহের মধ্যে উদ্দীপনা বয়ে নিয়ে যায় যেসব সংবেদী স্নায়ু, তাদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হচ্ছে। দেখা গেল, যে থলির মধ্যে ভ্রূণটা থেকে টিউমার কোশকে তার ভিতরে বসালে যা হচ্ছে, বাইরে বসালেও তাই হচ্ছে। অর্থাৎ ভ্রূণের সঙ্গে টিউমার কোশের সরাসরি সংযোগ না থাকলেও স্নায়ুকোশের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি কোনওভাবেই ব্যাহত হচ্ছে না। রিটা অনুমান করলেন, টিউমার কোশ থেকে হয়তো এমন কোনও বৃদ্ধি-উপাদান ছড়াচ্ছে যারা বিশেষ কিছু স্নায়ুকোশের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এদের নাম রাখা হল নার্ভ গ্রোথ ফ্যাক্টর (NGF)।

এবার শুরু হল NGF-এর সক্রিয়তা বিচারের কাজ। দেখা গেল

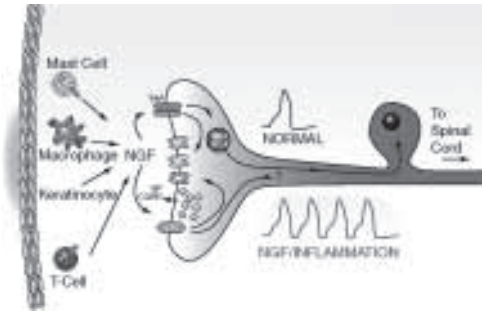

অল্প একটু NGF যোগ করার তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যেই সংবেদী স্নায়ুকোশ বিক্রিয়া করতে শুরু করে দিচ্ছে। রিটা দেখলেন ১ মিলি-লিটার পদার্থে ১ গ্রামের একশ' কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র NGF থাকলেই স্নায়ুকোশগুলো খুব দ্রুত হারে বাড়তে শুরু করছে; NGF যোগ করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেখান থেকে স্নায়ুতন্তু বেরোতে শুরু করছে; আর এক দিনের মধ্যেই, সূর্য থেকে যেমন চারদিকে আলোর ছটা বেরিয়ে আসে, NGF-আক্রান্ত স্নায়ুকোশগুলোর চেহারা হয়ে যাচ্ছে অনেকটা সেরকম।

খুব স্বাভাবিকভাবেই এবার শুরু হল NGF-এর উৎসের খোঁজ। এসময়ে ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে রিটার সঙ্গে গবেষণায় যোগ দিলেন বায়োকেমিস্ট স্ট্যানলি কোহেন। তারা ইঁদুরের টিউমার কোশ থেকে প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ NGF আলাদা করতে সমর্থ হলেন। দেখা গেল সাপের বিষ যেমন NGF হিসেবে দারুন কাজ করতে পারে, আবার পুরুষ ইঁদুরের লালগ্রন্থিও NGF-এর একটা ভালো উৎস হতে পারে। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর সংখ্যায় প্রসিডিংস অফ দি ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এ ছাপা হল তাদের সেই বিখ্যাত পেপার। হই-চই পড়ে গেল সারা বিশ্বে। উন্মোচিত হল আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞান চর্চার এক নতুন দিগন্ত। আজকের দুনিয়ার অন্যতম সমস্যা যে আগ্রাসন আর উদ্বেগ, রিটা আর তার সহকর্মীদের গবেষণা থেকে জানা গেল এই দুই মানসিক সমস্যার পিছনে রয়েছে NGF-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আবার অ্যালজাইমার্স বা পারকিনসন্স রোগের সঙ্গে লড়তে হলেও আমাদের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিতে হবে এই NGF-কেই। সারা পৃথিবী জুড়ে এখনও চলছে এই NGF-চর্চা। জানা যাচ্ছে এর নতুন নতুন বিচিত্র সব ক্রিয়াকলাপের কথা।

NGF-এর চূড়ান্ত সাফল্যের পর খুব স্বাভাবিক কারণেই ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় রিটাকে আহ্বান জানাল অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়া জন্য। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সেখানে পড়ানোর পর রিটা ফিরে গেলেন ইতালিতে। ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দিলেন রোমের রিসার্চ সেন্টার অফ নিউরোবায়োলজিতে। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত পরিচালনা করেছেন ল্যাবরেটরি অফ সেলুলার বায়োলজি। এরপর ইনস্টিটিউট অফ সেল বায়োলজির প্রধান হিসেবে অবসর নেন ১৯৭৯ সালে। তবে পড়ানো ছাড়েননি। অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করে গেছেন বেশ কিছুদিন।

তার সঙ্গে চলছিল আগাথা ক্রিস্টি চর্চা। যেভাবে খুঁজে বের করেছিলেন NGF-কে, ঠিক সেভাবে গোয়েন্দা গল্পের অপরাধীকে খুঁজে বের করার নেশাটাও জমে উঠেছিল বেশ। সেই তাগিদেই খুলে বসেছিলেন, 'এভিল আন্ডার দি সান' বইখানি। সালটা ১৯৮৬, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ। গল্পটা সবে জমতে শুরু করেছে এমন সময়ে বেজে উঠল টেলিফোন। 'কল ফ্রক স্টকহোম'। ফোনটা ছেড়ে বললেন, 'খুঁজছিলাম অপরাধী, পেয়ে গেলাম নোবেল'। হ্যাঁ, সে বছরের চিকিৎসাবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পেলেন রিটা, সঙ্গে স্ট্যানলি কোহেন। কারণটা অবশ্যই, 'এভিল' নয়, NGF খুঁজে বের করার সাফল্য। সায়েন্স পত্রিকার ভাষায় for finding 'the good in the bad'। অন্ধকার উৎস থেকে আলোর বার্তা বয়ে আনার সেই গল্প পরে লিখেছিলেন তার আত্মজীবনীতে, In Praise of Imperfection : My Life and Work (Basic Books, New York, 1988)।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রেও রিটার অবদান কম নয়। আফ্রিকার মহিলাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদানের জন্য যমজ বোন পাওলোর সঙ্গে তৈরি করেছিলেন রিটা লেভি মন্টালসিনি অনলাস ফাউন্ডেশন। সারা বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের রাষ্ট্রদূত হিসেবেও নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ২০০২ সালে নিজের উদ্যোগে গড়ে তোলেন ইউরোপিয়ান ব্রেন রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

একশ' বছর বয়সে যিনি সগর্বে বলতে পারেন 'জীবনে আমি কখনো ক্লান্ত হইনি', এহেন কর্মকান্ড তো তার পক্ষেই সম্ভব। আবার এই ক্লান্তিহীন দীর্ঘ জীবনের রহস্যটা কী জানিয়ে গেছেন তাও। খাও কম, মাথাকে সচল রাখো নিরন্তর, আর দুঃখকে ঝেড়ে ফেলো চিরতরে। তবুও তো থামতে হয়। ২০১২ সালে ৩০ ডিসেম্বর থামতে হল তাকেও। বয়স তখন ১০৩। অপূর্ণতার প্রশস্তি রচয়িতা ক্লান্তিহীন রিটার জীবনাবসান হল।

Email : anindya05@gmail.com, M. 9432220412

ভ বা নী প্র সা দ সা হু

এনকেফালাইটিসের চিকিৎসায় ওঝা-গুণিন!

এনকেফালান বলতে বোঝায় মস্তিষ্ক। তার প্রদাহ হলে বলা হয় এনকেফালাইটিস। মস্তিষ্কের আবরনীর নাম মেনিনজেস। তার প্রদাহ হলে তাকে বলা হয় মেনিনজাইটিস। অনেক সময় দু'টিই একসঙ্গে আক্রান্ত হয়, মেনিঙ্গো-এনকেফালাইটিস। যক্ষ্মা ও পুঁজ সৃষ্টি করে এমন ধরনের জীবাণু সংক্রমণে এটি ঘটতে পারে। এখন উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক জানা থাকায় এটি সম্পূর্ণ নিরাময় যোগ্য। তবে রোগটি ভয়াবহ। দেরি হলে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

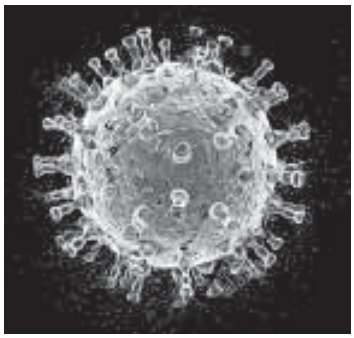

কিন্তু আরো ভয়াবহ হল এক ধরনের ভাইরাস (গ্রুপ বি আর্বোভাইরাস) থেকে ঘটা বিশেষ ধরনের এনকেফালাইটিস, যা জাপানিজ এনকেফালাইটিস নামে পরিচিত। কিউলিসিস বিষ্ণুই, কিউলিসিস ট্রাইটিনিওরিনকাস ধরনের মশার কামড় থেকে এই ভাইরাস আক্রান্ত শুয়োরের থেকে মানুষের মধ্যে ছড়ায়। কিন্তু শূকরের মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। আর আক্রান্ত মানুষ থেকে অন্য মানুষেও ছড়ায় না।

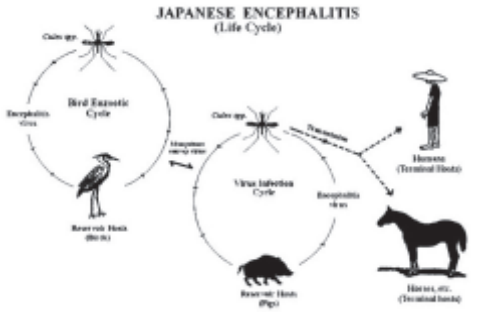

রোগটি ভয়াবহ, কারণ এর থেকে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এমনকি ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৫০–৬০ জনও মারা যেতে পারে। প্রবল জ্বর, খিঁচুনি, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, শেষ অব্দি অজ্ঞান হয়ে মৃত্যু। যক্ষ্মার মতো সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিক নেই। হাসপাতালে ভর্তি করে পরীক্ষা করার পর শিরা দিয়ে ডেক্সট্রোজ-স্যালাইন, অন্যান্য ওষুধপত্র ইত্যাদি দেওয়া, সঙ্গে অক্সিজেন ও জীবনদায়ী অন্যান্য ব্যবস্থা— এসবের ফলে অবশ্য বহু রোগীকেই বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব।

সব মিলিয়ে এনকেফালাইটিস, মেনিনজাইটিসের মতো রোগ হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা শুরু করাটাই জরুরি। অভিজ্ঞতা থেকে অনেকে তা জানেনও। ওঝাগুনিনের মতো লোকেদের পক্ষে রোগের চিকিৎসা করা যে সম্ভব নয়, তাও অনেকে জানেন। কিন্তু আমাদের মতো দেশে মিথ্যা বিশ্বাস আর কুসংস্কার এখনো এত বেশি ব্যাপক যে, এই সাধারণ সচেতনতারও অভাব ঘটার উদাহরণ কম নেই। সরকারিভাবে গ্রামেগঞ্জের অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত, দরিদ্র মানুষজনের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য বহু আশাকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নানা রোগ সম্পর্কে, মেয়েদের নানা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করেন, প্রয়োজনে দু'একটি ওষুধপত্রও দেন। রোগিদের তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। এই সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরের এক আশাকর্মীকে জ্বর আর এনকেফালাইটিসের নানা উপসর্গের জন্য মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রোগী প্রায় অজ্ঞান, খিঁচুনিও ছিল। রোগীর আত্মীয়স্বজনেরা যথাসম্ভব ভাবলেন, খিঁচুনি টিচুনি যখন হচ্ছে তখন ভূতে ধরা বা ওই ধরনের কোন কিছু ব্যাপার ঘটেছে। আর এক্ষেত্রে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কী আর চিকিৎসা হবে! এর জন্য ওঝা-গুণিনই আসল লোক, যে রোগীর সঠিক চিকিৎসা করতে পারবে। যেই ভাবা সেই কাজ। ভর্তি করার রাতেই তাঁরা রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে ডেবরা-র এক গুণিনের কাছে নিয়ে যান। কিন্তু সরকারি আশাকর্মীর এমন কান্ডকারখানার খবর কানে যাওয়া মাত্র দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে তাঁকে হাসপাতালেই আবার ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। যাঁর কাজ স্বাস্থ্যসচেতনতা গড়ে তোলা (সেই সঙ্গে পরোক্ষভাবে রোগব্যাধি নিয়ে মানুষের মধ্য থেকে কিছু ভুল ধারণা ও কুসংস্কার দূর করা), সেই আশাকর্মীর এমন ঘটনাটি সংবাদপত্রের পাতায় স্থান করে নেয়। না হলে আমাদের পক্ষে জানাই সম্ভব হত না এবং এই যেখানে অবস্থা, সেখানে আরো কতজনই যে এভাবে সত্যিকারের চিকিৎসা না করিয়ে ওঝা-গুণিনের আশ্রয় নেন, তাও অনুমান করা যায়।

ওঝাগুণিনের মতো মানুষজনের সাহায্য নেওয়ার জন্য ছুটে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় কারণ কাজ করে হাতের কাছে উপযুক্ত চিকিৎসা সহজলভ্য না থাকা। তাই বিপদে আপদে, রাত বিরেতে ওঝাগুণিনের কাছেই ছোটা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা তা ছিল না। রোগীকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করাই হয়েছিল। তাই এখানে মিথ্যাবিশ্বাস আর কুসংস্কারের প্রাবল্যই কাজ করেছিল, যার পরিণতি হতে পারত প্রাণঘাতী। গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে থাকা ওঝাগুণিনদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলার গুরুত্বও এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

Email : sahoo2331953@gmail.com, M. 9733400443

রাজদীপ ভট্টাচার্য

ভূগর্ভের আশ্চর্য জগতে

কবি শঙ্খ ঘোষের বহু পঠিত 'বাবুমশাই' কবিতার কয়েকটি লাইনকে অনুসরণ করে বলাই যায়, এ পৃথিবীর মধ্যে আছে আরেকটা পৃথিবী তাকে জানতে শিখুন। হ্যাঁ, পৃথিবী মানে শুধু এই সূর্যালোকিত পাহাড়-পর্বত-মালভূমি-সমভূমি-অরণ্য-জলভাগ-বরফ-বালি দ্বারা শোভিত পরিচিত ছবির সমাহার নয়। এই চেনা পৃথিবীর গভীরে লুকিয়ে আছে আর এক অচেনা পৃথিবী। অজানা জগত।

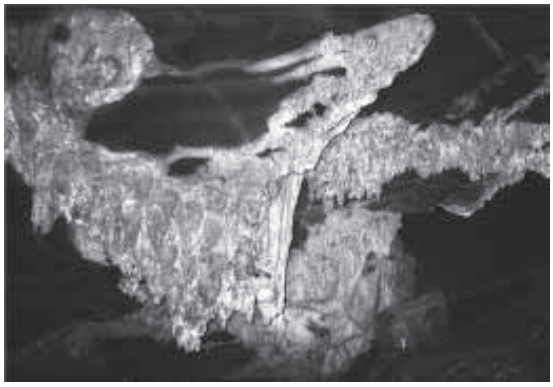

প্রকৃতির তৈরী ভাস্কর্য

আমি বলছি ভূগর্ভের গুহাপথগুলির কথা। সম্প্রতি সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এমনি একটি গুহা। থাইল্যান্ডের উত্তরপ্রান্তের একটি প্রাকৃতিক গুহা হল 'থাম লুয়াং', যার অর্থ 'Great Cave'।

গুহাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০.৩ কিমি। এর প্রথম কয়েক কিলোমিটার পথ শুষ্ক ঋতুতে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত সাধারণ পর্যটকদের জন্য খোলা থাকে। মৌসুমী বায়ুর আগমনের সঙ্গে বৃষ্টিপাতের প্রভাবে গুহাটির বড় অংশ জলে নিমজ্জিত হয় এবং তা যাতায়াতের পক্ষে অযোগ্য হয়ে পড়ে। যাইহোক সম্প্রতি গত ২৩ জুন ছোটদের ফুটবল দলের ১২ জন সদস্যদের (১১–১৭ বছরের) নিয়ে তাদের ২৫ বছর বয়সী কোচ গুহাটির ভিতরে অভিযানে গিয়ে আকস্মিক বৃষ্টিপাতে

আটক ছাত্ররা

অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অতঃপর প্রাথমিক ভাবে সেই তেরো জনের মৃত্যু আশঙ্কা করা হলেও উদ্ধারকারী দল অবশেষে গুহামুখ থেকে প্রায় চার কিলোমিটার ভিতরে জল থেকে সামান্য উপরে জেগে থাকা পাথরের উপর তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে। ২ জুলাই বিষয়টি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত হলে সারা বিশ্বের নজর পড়ে দুর্গত কিশোর দল ও তাদের কোচের উপর। ইতিমধ্যে উদ্ধার কাজে গিয়ে প্রাক্তন নৌকর্মী সামান কুনান' এর মৃত্যু হয়।

অভিজ্ঞ প্রশিক্ষিত উদ্ধারকর্মীর মৃত্যু বুঝিয়ে দেয় সেই গুহাপথের ভয়াবহতা। গুহাটি স্থানে স্থানে অতি সংকীর্ণ। এতটাই যে উদ্ধারকারীদের অক্সিজেন সিলিন্ডার ইত্যাদি খুলে ফেলে পুনরায় পথ পেরিয়ে এসে পরে নিতে হয়। প্রায় বুক ঘষে এগোতে হয় পথ। কোথাও একটানা দীর্ঘপথ জলকাদায় নিমজ্জিত। এছাড়া তীব্র অন্ধকার, চারিদিকে অসমান পাথর, ক্রমহ্রাসমান অক্সিজেন, বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে জলস্তরের বৃদ্ধি, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে ওই তেরো জনের ক্রমহ্রাসমান শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা উদ্ধার কাজ প্রায় অসম্ভব করে তুলেছিল। অনুভবী বিশ্ববাসীর মনে ঘনীভূত হচ্ছিল আশঙ্কার মেঘ।

বন্ধুর পথে উদ্ধারকার্য

অবশেষে প্রায় ৯০ জন উদ্ধারকারী সঠিক পরিকল্পনা, বিভিন্ন আধুনিক সরঞ্জাম ইত্যাদির সাহায্যে ৮-১০ জুলাই লাগাতার অপারেশন চালিয়ে ১৩ জনকেই অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে। সফল হয় বিশ্ববাসীর প্রার্থনা।

উত্তর থাইল্যান্ডের 'থাম লুয়াং'-এর মতোই কত প্রাকৃতিক গুহা এই পৃথিবীর আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে। আর সেই সব গুহার অন্ধকারে জমে আছে আজও কত রহস্য, কত অজানা কথা।

চুন জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন শিলায় অ্যাসিড যুক্ত জলের রাসায়নিক ক্ষয়ে এই প্রকার গুহা এবং তার মধ্যে আরো কত চোখ ধাঁধানো ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। চুন দিয়ে তৈরি শিলাগুলির মধ্যে রয়েছে চুনাপাথর, মার্বেল, ডলোমাইট, ক্যালসাইট, চক ইত্যাদি। অন্যদিকে মাটির নীচে চুঁইয়ে নামা জলের সঙ্গে CO_2 মিলে তৈরি হয় মৃদু আম্লিক কার্বোনিক অ্যাসিড। এই প্রকার অ্যাসিড যুক্ত জলের সংস্পর্শে এসে সহজেই কার্বোনেশন বা অঙ্গারযোজন প্রক্রিয়ায় চুন বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পরিবর্তিত হয় জলে দ্রাব্য ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেটে। ফলে তা জলে গুলে ক্ষয় পায়।

$$H_2O + CO_2 = H_2CO_3$$

(কার্বোনিক অ্যাসিড)

$$CaCO_3 + H_2CO_3 = Ca(HCO_3)_2$$

ক্যালসিয়াম কার্বোনেট — ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট

এই কারণে ভূপৃষ্ঠে কোনো বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে চুন জাতীয় শিলা থাকলে সেখানে হাজার হাজার বছর ধরে চুন অ্যাসিড যুক্ত জলের প্রভাবে ক্ষয় পেয়ে এবং পরে সঞ্চিত হয়ে বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপ সৃষ্টি করে। পূর্ব ইউরোপে অতীতের যুগোশ্লাভিয়া দেশের কার্স্ট (Karst) নামক মালভূমিতে এই প্রকার ভূমিরূপের আদর্শ বিকাশ দেখা যায়। এই নাম থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও সমপ্রকৃতির ভূমিরূপকে কার্স্ট ভূমিরূপ বলে।

কার্স্ট অঞ্চলে ক্ষয়ের ফলে বিভিন্ন আকারের গর্ত সৃষ্টি হয়। ক্রমবর্ধমান আকারের ভিত্তিতে তাদের সোয়ালো হোল, সিঙ্ক হোল, ডোলাইন, ইউভালা, পোলজি প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হয়। ভূগর্ভে

সোয়ালো হোল

সিংক হোল

শিলার এই প্রকার দ্রবণ ক্ষয়ের ফলেই কালক্রমে গুহার উৎপত্তি ঘটে। গুহার ভিতরে অনবরত চুঁইয়ে নামা জলের সঙ্গে চুনের কণা পাথরের গায়ে সঞ্চিত হতে থাকে। এভাবে গুহার ছাদ থেকে চুনের সঞ্চয় বটের ঝুরির মতো নেমে আসে, একে স্ট্যালাক-টাইট বলে। তা থেকে চুঁইয়ে পড়া জল নীচে মেঝেতে কিছুটা ভোঁতা আকারে চুনের সঞ্চয় ঘটায়, একে স্টালাগমাইট বলা হয়। গুহার দেয়ালে, মেঝেতে এভাবেই চুনের

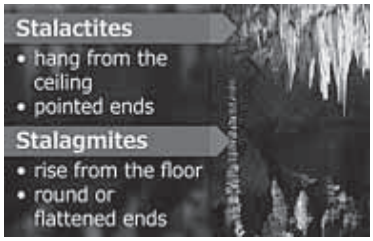

বহু বিচিত্র আকারে সঞ্চয়ের দিকে সামান্য কল্পনার চোখ মেলে তাকালে শিবলিঙ্গ, বটের ঝুরি, বৃক্ষ প্রভৃতি কত পার্থিব চেনা বস্তুকে খুঁজে পাওয়া যায়। গুহাগুলির আকারও বৈচিত্র্যময় হয়। তারা সংকীর্ণ, প্রশস্ত, গভীর, জলে নিমজ্জিত, গ্যালারীর মতো একাধিক স্তরে অবস্থিত প্রভৃতি হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই ভূগর্ভে গুহাগুলির বিন্যাস, বিস্তার প্রভৃতি অজানা থেকে যায়। কোনো সঠিক মানচিত্র বা নকসা পাওয়া যায় না। তাই গুহাগুলিকে ঘিরে রয়ে যায় রহস্যের পর্দা আর কুয়াশার মায়াবী আস্তরণ।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তেও এই প্রকার কার্স্ট ভূমিরূপ এবং গুহার উপস্থিত বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশে বেলুম গুহা (3.2 km) ও বোরা গুহা (0.63 km); ছত্তিশগড়ে জগদ্দলপুরের নিকটে কুটুমসর গুহা (0.66 km); উত্তরাখণ্ডে পাতাল ভুবনেশ্বর, তপকেশ্বর প্রভৃতি গুহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর পূর্বভারতে মেঘালয় রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে কার্স্ট ভূমিরূপ ও গুহার উপস্থিতি লক্ষণীয়। এখানে খাসি পাহাড়ে দাম, মাওমলুহ্, মৌসিনরাম, ফাইলুট, মৌসমাই প্রভৃতি; জয়ন্তীয়া পাহাড়ে কোটমাতি (3.7 km), লাশিং (2.7 km), লিয়াত প্রাহ্ (3.1 km), উম-লওয়ান (6.4 km) এবং গারো পাহাড়ে বকবাক ডোভাকোল, ডোভাকোল চিবেনালা, সিজু-ডোবখাকোল (4.8 km), তেতেংকোল-বালোয়াকোল (5.3 km) প্রভৃতি গুহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে লিয়াত প্রাহ্ ভারতীয় উপমহাদেশের দীর্ঘতম গুহা। উত্তরবঙ্গের বক্সা-জয়ন্তী অঞ্চলে মহাকাল গুহাটিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এই প্রকার প্রাকৃতিক গুহাগুলিকে কেন্দ্র করে একপ্রকার বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও পাঠের বিকাশ ঘটেছে, যা 'Speleology' নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে গুহার বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপ, তাদের গঠন-সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য, গুহায় জীবনের অস্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা চলে। গুহার ভিতরে শিলাস্তর, ক্ষয়ের প্রকৃতি প্রভৃতি দেখে প্রাচীন কালের পরিবেশ, জলবায়ু, জীবজগত এইসব ব্যাপারে বহু তথ্য পাওয়া যায়। অনেকক্ষেত্রেই এই গুহাগুলির সঠিক মানচিত্র নেই, তাই কিছুটা অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা এবং রহস্য গুহাগুলিকে ঘিরে রেখে দেয়। গুহার ভিতরে অন্ধকার আর্দ্র পরিবেশে এক ভিন্ন জীবজগতের বিকাশ ঘটে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য গুহার অভ্যন্তরে জীবেদের মধ্যে বিশেষ অভিযোজন দেখা যায়। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, National Cave Research & Protection Organisation প্রভৃতির নেতৃত্বে বিজ্ঞানীরা গুহার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বিষয়ে গবেষণায় ব্যস্ত রয়েছে। এভাবেই কুটুমসর গুহা থেকে মিলেছে অন্ধ ও অ্যালবিনো মাছ (Nemacheilus Evezardi) কিংবা বেলুম গুহায় আবিষ্কার হয়েছে দ্বিতীয় ভারতীয় হাইপোজিন প্রজাতি— *Andhracoides gebaueri*।

আজ এই আকাশভরা স্যাটেলাইটের যুগে যখন মাটির উপর দিয়ে একটি পিপড়ে হেঁটে গেলেও তা ক্যামেরার চোখে ধরা পড়ে যায়, তখনো এই চুনাপাথরের রহস্যময় গুহাগুলি তার নিজস্ব অন্ধকারের জগতে আগ্রহী পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাই সমগ্র বিশ্বজুড়ে এই প্রকার গুহাগুলিকে কেন্দ্র করে পর্যটনের বিকাশ ঘটে। সুইজারল্যান্ডের হোলোক গুহা, ফ্রান্সের গুফ্রে বার্জার, USA-এর ম্যামথ বা কার্লসবাড গুহা এক্ষেত্রে বহুল পরিচিত। সঠিক গবেষণা, সংরক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিচালন ব্যবস্থার সাহায্যে আগামী দিনে ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা গুহাগুলিকে কেন্দ্র করে পর্যটনের এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে অগ্রগতির ক্ষেত্রে জোয়ার আসবে— এমনটা আশা করা যেতে পারে।

Email : rajdip5678@gmail.com, M. 9836569850

র ত ন দে ব না থ

পার্কার সোলার প্রোব

সূর্য আমাদের এক অতি পরিচিত নক্ষত্র। দিনের আকাশে প্রতিদিন যার দেখা মেলে। পরিমিত তাপ এবং আলো দিয়ে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই সূর্যই। পৃথিবী থেকে এতটাই দূরে রয়েছে যে, প্রায় ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিলোমিটার ব্যাসের এই নক্ষত্রটিকে আমাদের চোখে মনে হয় যেন মাত্র ২০-২৫ সেন্টিমিটার ব্যাসের এক গোলক। দিনের আকাশে সূর্যকে আমরা যেমন দেখি সেটাই সূর্যের সবটা নয়—এটি সূর্যের মাঝের অংশ মাত্র। এর নাম আলোকমন্ডল। এটিই সূর্যের প্রধান অংশ, সূর্যের প্রচন্ড তাপ এবং আলোর উৎস এটিই। ঘন, ভারী, অস্বচ্ছ এবং অতি উজ্জ্বল এই অংশটিতেই সূর্য দেহের সবটাই প্রায় ঘনীভূত। সূর্যের এই দেখা অংশটি ছাড়াও রয়েছে না দেখা এক অংশ যা দেখা যায় সূর্যগ্রহণের সময়ে। অনুজ্জ্বল, পাতলা এবং প্রায় স্বচ্ছ বাইরের এই অংশটি ভিতরের অংশটির চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে মেঘের মত। সার্বিক ভাবে এটি ‘সৌর বায়ুমন্ডল’।

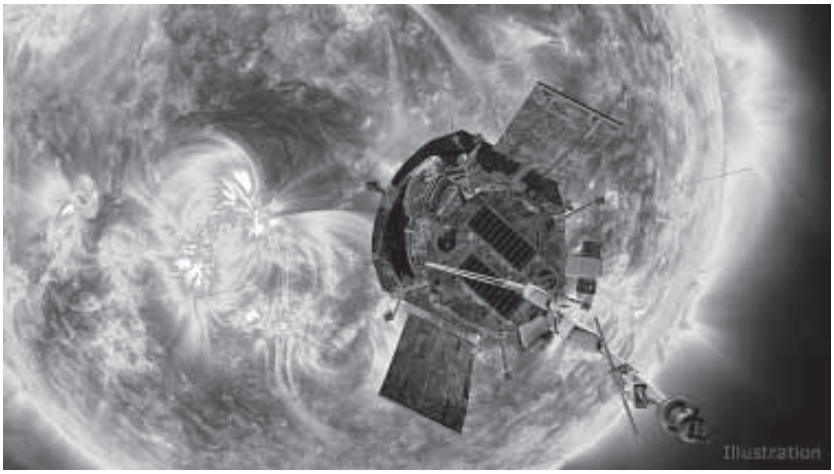

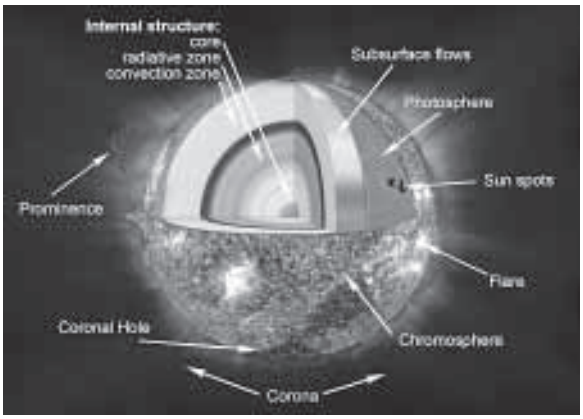

সৌর বায়ুমন্ডলের রয়েছে বিভিন্ন অংশ। আলোকমন্ডলের লাগোয়া স্তরটির নাম ‘বিশোষক মন্ডল’। প্রায় ১০০০ কিলোমিটারের উচ্চতার এই স্তরটির তাপমাত্রাও বেশ কম। বিশোষক মন্ডলের পরে যে স্তরটি রয়েছে তা বেশ বর্ণাঢ্য। সোনালি বর্ণের এই স্তরটির উচ্চতা প্রায় ১৬০০০ কিলোমিটারের মত এবং তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর মত।

সৌরদেহের সব শেষ অংশটি হল ‘করোনা’ বা ‘সৌর কিরীট’। বর্ণমন্ডলের পরের এই অংশটি সৌরদেহকে ঘিরে রয়েছে পাতলা চাদরের মত। সৌর কিরীটের উজ্জ্বলতা খুব বেশি নয়। সূর্য থেকে দূরত্ব যতই বাড়ে উজ্জ্বলতা ততই কমতে থাকে। কিরীটের বিস্তার সূর্য দেহ থেকে কয়েক মিলিয়ন কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

সম্প্রতি আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যারনেটিক্স এন্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ‘পার্কার সোলার প্রোব’ নামে এক মহাকাশযান পাঠিয়েছে সূর্যের ঠিকানায়। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক ইউজিন পার্কার ’৫-এর দশকে সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র থেকে শক্তির বিকিরণ সম্বন্ধে উপস্থাপন করেন অনেক ধারণার। শক্তির এই বিকিরণের সাথে জড়িয়ে রয়েছে চৌম্বক ক্ষেত্র, প্লাজমা, বিভিন্ন শক্তিশালী কণিকা প্রভৃতির এক জটিল প্রক্রিয়া—একসঙ্গে যার নাম দিয়েছিলেন সোলার উইন্ড। তাঁরই সম্মানে মহাকাশযানটির নামকরণ হয়েছে পার্কার সোলার প্রোব। উদ্দেশ্য, সৌর কিরীটের বহিরাংশের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

মোটামুটি ছোট একটি গাড়ির আকারের মহাকাশযানটি কেপ ক্যানাভেরাল এয়ার ফোর্স স্টেশন থেকে ইউনাইটেড লঞ্চ এলায়েন্স ডেল্টা-4 হেভি রকেটের ঘাড়ে চেপে সূর্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে ১২ আগস্ট ২০১৮। কোন মহাকাশযানকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াটা একটা বড় এবং বেশ দুরূহ কাজ। মহাকাশযানটির গতি এবং গতিপথ দুইই নিয়ন্ত্রণ করে তবে তাকে লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়। সরাসরি কাজটি করতে সময় এবং জ্বালানি খরচ দুইই হয় খরচ সাপেক্ষ। তাই বিকল্প কারিগরীর সাহায্য নিয়ে কাজটি করা হয়। গ্র্যাভিটি অ্যাসিসটিং এরকমই একটি প্রক্রিয়া যেখানে অন্য কোন গ্রহের অভিকর্ষ ক্ষেত্রকে কাজে

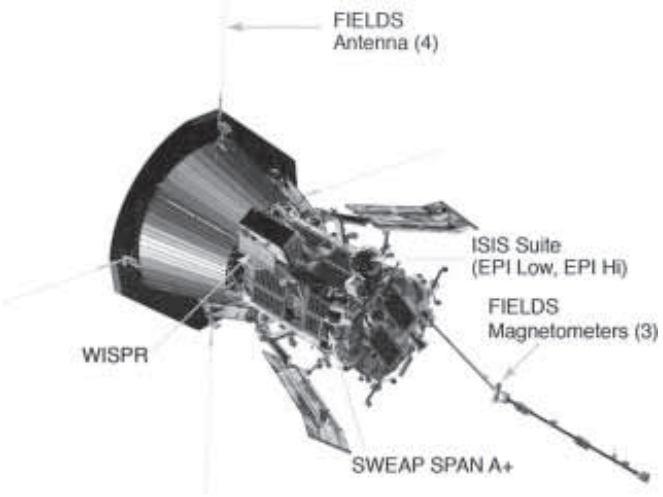

লাগিয়ে মহাকাশযানের গতি এবং গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সাত বছরের সময় কালের যাত্রায় পার্কার মহাকাশযানটিকে সূর্য থেকে প্রায় ৬.২ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে পৌঁছতে সাত সাত বার শুক্রগ্রহের অভিকর্ষকে কাজে লাগানো হবে।

সৌর কিরীট পর্যবেক্ষণ করে সূর্য সম্পর্কিত নানান রহস্য উন্মোচনই পার্কার মহাকাশযানের মূল লক্ষ্য। সূর্য থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও সৌর কিরীটের তাপমাত্রা সৌরপৃষ্ঠের তাপমাত্রার চেয়ে প্রায় ৩০০ গুণ বেশি। এর কারণ কি? সোলার উইন্ডই বা কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে সারা সৌরজগৎময়? সূর্য থেকে বেড়িয়ে পড়া বিভিন্ন শক্তিশালী কণা যারা আলোর গতিবেগের প্রায় অর্ধেক বেগে ছিটকে বেরয় তাদের এই এত গতিরই বা কারণ কী? এসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজবে পার্কার। বিগত ৬০ বছর ধরে প্রশ্নগুলো খোঁচা দিচ্ছিল জ্যোতির্বিদদের। কিন্তু সূর্যের অত কাছে কোন মহাকাশযান পৌঁছে দিয়ে সে পরীক্ষা করবার মত কারিগরী ব্যবস্থা এযাবৎ কাল ছিল না। কেননা সৌর কিরীটের প্রচন্ড তাপে মহাকাশযান গলে গিয়ে তার অস্তিত্বই থাকবে না। এবার অবশ্য নামা হয়েছে আটঘাট বেঁধেই।

সৌর কিরীটের প্রচন্ড তাপমাত্রায় পার্কার যাতে গলে না যায় তার জন্য সাহায্য নেওয়া হয়েছে অত্যাধুনিক তাপীয় কারিগরী ব্যবস্থার। ৪.৫ ইঞ্চি বেধের কার্বন-কার্বন যৌগিক তাপ প্রতিরোধক রক্ষা করবে পার্কার এবং তার অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন যন্ত্রাদি। কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যে দিয়ে গেলেও তাপ প্রতিরোধকটির পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা হবে মাত্র ১৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মত। আর ভিতরে যেখানে যন্ত্রাদি রয়েছে তা থাকবে দিব্যি ঘরের তাপমাত্রা প্রায় ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছিতে। তাই কোন অসুবিধাই হবে না।

কী হবে সূর্যকে ছুঁয়ে? সূর্য আমাদের নিকটতম নক্ষত্র। তাই অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় সূর্যকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা সহজ। আর সূর্যকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অন্যান্য নক্ষত্র সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। পৃথিবীর তাপ এবং আলোর উৎস হল সূর্য। তাই সূর্যকে পর্যবেক্ষণের সাথে সাথে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার কিভাবে হল তার আঁচও পাওয়া যেতে পারে। সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত আয়নিত গ্যাস অণু, বিভিন্ন শক্তিশালী কণা প্রচন্ড গতিতে আঁছড়ে পড়ছে পৃথিবীর দিকে। যাদের বলে সোনার উইন্ড বা সৌরঝড়। সৌরঝড় কোন কোন সময় পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটায় ভূ-সংলগ্ন আকাশের পরিবেশের যার প্রভাবে পড়ে কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথের উপর, কমিয়ে দেয় তাদের জীবনকাল, নষ্ট করতে পারে উপগ্রহস্থিত বিভিন্ন ইলেকট্রনিয় যন্ত্রাদি। তাই উপগ্রহাদির রক্ষার ক্ষেত্রে ভূ-সংলগ্ন আকাশের পরিবেশের অবস্থা সম্পর্কে আগাম জ্ঞান বিশেষ জরুরি। তাই এসব বিষয় বিবেচনা করলে বোঝা যায় পার্কার সোলার প্রোব হবে বেশ কার্যকরী।

Email : rdebnath1961@gmail.com, M. 9477934928

অ নি ন্দ্য দে

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

কণ্ঠস্বর বিভ্রাট

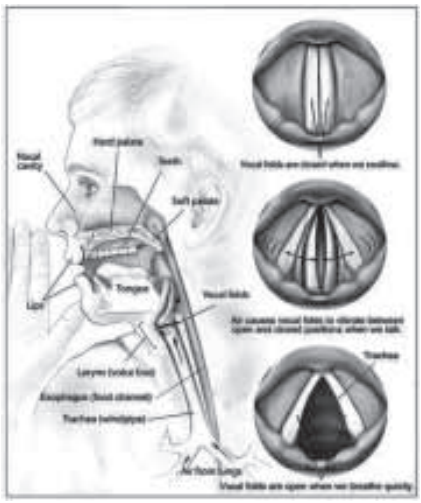

আপনার নিজের গান বা কবিতা রেকর্ড করে শুনেছেন কখনো? নিজের গলাটা কেমন অচেনা লাগে না? কিন্তু আপনার বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের লোকজন যখন সেই রেকর্ডিংটা শোনেন তারা কিন্তু বলেন, 'কই ঠিকই তো আছে। অন্যরকম কিছু তো মনে হচ্ছে না।' তাহলে গন্ডগোলটা কোথায়? আপনার গলা আপনি চিনতে পারছেন না, অথচ শ্রোতারা বলছেন সব ঠিক আছে। তাহলে সমস্যাটা কি আপনার কানে? না, মোটেও তা নয়। ব্যাপারটা একেবারেই স্বাভাবিক।

আসলে আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদের নিজেদের কণ্ঠস্বর আমাদের কানে পৌঁছায় দুটো রাস্তা দিয়ে। আমাদের স্বরতন্ত্রীর (Vocal Cord) কম্পনে মস্তিষ্কে যে আন্দোলন হয়, শব্দতরঙ্গ সেই আন্দোলনের ফলে কানে পৌঁছায়। পোশাকি ভাষায় একে বলে বোন কন্ডাকশন (Bone Conduction)। আবার, বায়ুপথে প্রবাহিত হয়ে কানের পর্দায় কম্পন তৈরি করেও শব্দ তরঙ্গ আমাদের কানে ঢোকে। আমার জন্য দুটো রাস্তা খোলা থাকলেও শ্রোতার কাছে বা টেপ রেকর্ডারে আমার কণ্ঠস্বর পৌঁছায় কিন্তু শুধুমাত্র দ্বিতীয় রাস্তাটা দিয়েই।

এদিকে মাথার ভিতরের গঠনটা আবার এমনই যে কম কম্পাঙ্কের গভীর শব্দগুলো সে পথ দিয়ে অনেক সহজে প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু বায়ুপথ দিয়ে সহজে চলাচল করতে পারে বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গগুলো। সুতরাং, কেউ যখন তার নিজের কণ্ঠস্বর শুনবেন, তখন এই দুই ধরনের তরঙ্গই তার কানে ঢুকবে। অথচ টেপ রেকর্ডারে বা শ্রোতার কানে যাবে শুধু বেশি কম্পাঙ্কের শব্দগুলো। সুতরাং, দুটো শব্দের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক।

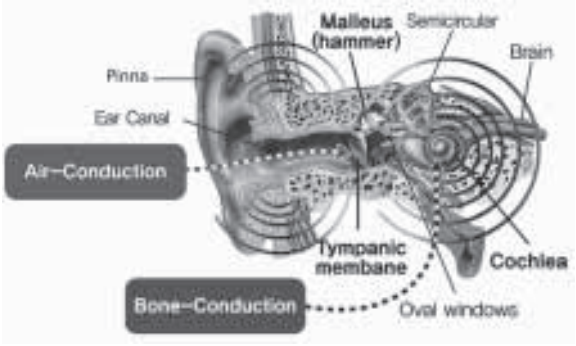

জানো কি?

বিজয় সরকার

❑ শুকনো কাগজ ছিঁড়লে শব্দ হয়, কিন্তু ভেজা কাগজ ছেঁড়ার সময় শব্দ হয় না কেন?

যে কোনো শব্দের সৃষ্টি হয় কম্পন থেকে। আর শব্দ শোনার জন্য প্রয়োজন হয় একটি মাধ্যমের। তা কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় মাধ্যম হতে পারে। কঠিন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শব্দ যত দ্রুত যায়, তরল বা গ্যাসীয় মাধ্যমে তত দ্রুত যায় না। এছাড়া বস্তুর ঘনত্বের উপরও শব্দের তীব্রতা নির্ভর করে। বস্তুর ঘনত্ব যত বেশি শব্দও তত বেশি হবে।

কাগজ ছেঁড়ার সময় আমরা যে শব্দ শুনি তা হল কাগজের মধ্যে যে আঁশ বা তন্তু থাকে, সেগুলির মধ্যে ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট আওয়াজ। শুকনো কাগজ ছেঁড়ার সময় যে শব্দ সৃষ্টি হয়, তা কঠিন (কাগজ) ও গ্যাসীয় (বায়ু) মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আমাদের কানে পৌঁছায়। অন্যদিকে, ভেজা কাগজ ছেঁড়ার সময় শব্দ আসে তরল মাধ্যম থেকে (যেহেতু কাগজের আঁশগুলির মধ্যবর্তী ফাঁকে জল থাকে)। এছাড়াও ভেজা কাগজের আঁশগুলির মধ্যে ঘর্ষণও অনেক কম হয়। অর্থাৎ কম কম্পন, ফলে কম শব্দ।

❑ অন্ধকারে বিড়ালের চোখ জ্বলজ্বল করে কেন?

শুধুমাত্র বিড়াল নয়, গরু, কুকুর, বাঘ আরও অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর চোখ অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে। এর কারণ হল বিড়ালের অক্ষিপটে (চোখের ভেতরের দেওয়াল) দুরকমের কোষ আছে— রড কোষ ও কোন কোষ। কোন কোষ বেশি আলোতে এবং রড কোষ কম আলোতে দেখতে সাহায্য করে। বিড়ালের চোখে রড কোষের সংখ্যা বেশি। বিড়ালের চোখে অক্ষিপটের পেছনে এক ধরনের রঞ্জক আস্তরণ থাকে যার নাম 'ট্যামেটাম লুসিডাম', এর আলো প্রতিফলিত করার ক্ষমতা খুব বেশি। অন্ধকার রাতেও গ্রহ তারাদের একটা ক্ষীণ আলো থাকেই। বিড়ালের চোখে ট্যামেটাম লুসিডাম থাকার ফলে ক্ষীণতম আলো চোখের ভেতরে প্রতিফলিত হয়ে রড কোষগুলিকে উদ্দীপিত করে এবং আলোর প্রায় সবটুকুই সে ফিরিয়ে দেয়। প্রতিফলিত আলোয় চোখের ভেতরটা উজ্জ্বল হওয়ার জন্য অন্ধকারে দেখলে বিড়ালের চোখের ভেতরটা জ্বলছে বলে মনে হয়। বিড়ালের চোখের বিশেষ গড়নও তাকে অন্ধকারে দেখতে সাহায্য করে। বিড়াল একই সঙ্গে চোখের মণি বড় ও ছোট করতে পারে। অন্ধকারে চোখের মণি পুরোটা খুলে রাখে যাতে বেশি আলো চোখে ঢুকতে পারে।

e-mail : bijoysarkar4786@gmail.com, M. 9432335882

শ্রদ্ধার্ঘ্য (স্টিফেন হকিং)

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

স্বভাবে আগুন ছিলে—
দুর্নিবার
তোমার অগম যাত্রা
সব বাঁধা ভেঙে ফেলে
দহনে দহনে ছারখার—

পোড়াবার জন্য কিছু
সমিধের ছিল প্রয়োজন
আগুনই তো চেনে শুধু
আগুন চরিত্র—
স্বভাবে আগুন ছিলে
নত হওয়া আগুন জানে না।

প্রিয় পাঠক

- পত্রিকার জন্য আপনিও লেখা পাঠাতে পারেন। বিজ্ঞান অনুসন্ধানী অপ্রকাশিত লেখা পাঠান। লেখা হবে ৬০০ অথবা ১১০০ শব্দের মধ্যে।
- পত্রিকার সমালোচনা, পরামর্শ, গুণমান বিষয়ে অপানার সুচিন্তিত মতামত সাদরে গ্রহণ করব।
- পত্রিকার গ্রাহক হোন। বছরে ছ'টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা চল্লিশ টাকা। ডাকযোগে আপনার বাড়িতে পত্রিকা পাঠিয়ে দেব আমরাই।

পত্রিকা যোগাযোগ

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9332283356 ● জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 ● প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 ● কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 ● তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 ● কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 ● গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 ● পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর M. 9331035550 ● শিয়ালদহ স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) ● স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন M. 9153320581

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সর্দার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস

e-mail : bijnandarbar1980@gmail.com / ganabijnan@yahoo.co.in, Whatsapp No. 8240665747, website : www.ssu2011.com/bigyan-anneswak